করোনা অতিমারি এবং পুঁজিবাদ

চতুর্থ অংশ

করোনা অতিমারির নেপথ্যে

আপডেট স্টাডি গ্রুপ, ২৫.০৫.২০২০

করোনা অতিমারি যত ভয়াল রূপ গ্রহণ করেছে, বিশ্ব জুড়ে 'নন্দ ঘোষ' খোঁজার তৎপরতা ততই তুঙ্গে উঠেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প অম্লান বদনে চীনকে দায়ী করেছেন। চীনের উহান শহরের ভাইরোলজি ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরি থেকে নাকি এই ভাইরাসের উৎপত্তি এবং তার নাম হওয়া উচিত 'চীনা ভাইরাস'! এমনকি তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-কেও এক হাত নিয়েছেন কারণ 'হু' নাকি ''চীনের পুতুল''! ট্রাম্প সাহেব মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে চীন ও 'হু'র ব্যাপারে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সূত্র ১) বাবু যত বলেন, পারিষদরা চিরকালই তার থেকে বেশি বলেন। অতএব ট্রাম্প সাহেবের দল রিপাবলিকান পার্টি এবং তাদের বশংবদ সংবাদমাধ্যম বিষয়টিকে নিয়ে আরও সোচ্চার। যেমন চীন নাকি জৈব অস্ত্র তৈরি করছে এবং তা থেকেই করোনা ভাইরাসের বিস্তার। কেউ বলেছে, আগামী নির্বাচনে ট্রাম্পকে হারানোর জন্য এ নাকি ডেমোক্রাট দলের ষড়যন্ত্র। আবার, গূঢ় চক্রান্তের সন্ধানী কেউ কেউ বলেছে চীনা শক্তিকে প্রতিহত করতে স্বয়ং সিআইএ এই ভাইরাস সৃষ্টি করেছে। এমনকি বিল গেটস, ৫জি স্পেকট্রাম, ব্রিটিশ পারব্রাইট ইনস্টিটিউটের চক্রান্ত, ইত্যাদি নানা জাতীয় তত্ত্ব বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় চালাচালি হচ্ছে। (সূত্র ২) চক্রান্ত-তত্ত্বে এখন চীনও গলা মিলিয়েছে। গত ১২ মার্চ চীনের বিদেশ দপ্তরের মুখপত্র উহানে করোনা ভাইরাস আনার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীকে দায়ী করেছে। (সূত্র ৩) এছাড়া, বিশেষ কোনও জনগোষ্ঠীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর প্রচেষ্টাও আছে। বিশেষত পশ্চিমি দেশগুলোর অতি-দক্ষিণপন্থী নেতারা কলরব তুলেছে যে, এশিয়াবাসী ('পীত বিপদ'), অনুপ্রবেশকারী, উদ্বাস্তু, আফ্রিকানরা ভাইরাস ছড়াচ্ছে। সুতরাং এখনই দেশের সীমান্ত বন্ধ করে দাও। তার সঙ্গে, ভারতের শাসকবর্গের সুরে ইসলামোফোবিয়া, অর্থাৎ সব দোষ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপানোর প্রচেষ্টা তো আছেই। (সূত্র ৪) সব মিলে এক নরক গুলজার!

তবে সবাই ট্রাম্প সাহেব বা অতি-দক্ষিণপন্থীদের মতো 'নন্দ ঘোষ' খোঁজেননি। চীনের শিল্পোন্নত উহান শহর থেকে কোভিড-১৯ (করোনা) ভাইরাসের উৎপত্তি কীভাবে হল সে সম্পর্কে বহু বিজ্ঞানী/বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধানরত। ঐ ভাইরাস কোথা থেকে এল, তা কীভাবে ছড়াল তাঁদের তর্কবিতর্ক সেই প্রশ্নকে ঘিরে আবর্তিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হল, করোনা জাতীয় ভাইরাস, কিংবা নিপা, জিকা, ইবোলা, ইত্যাদি ভাইরাস কীভাবে ছড়াচ্ছে সে প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী/বিশেষজ্ঞদের গবেষণা বহু দিন ধরে চলছে। অবশ্য সে গবেষণার খবর নেতারা না-ও জানতে পারেন, কিংবা তাঁরা জেনেও না জানার ভান করতে পারেন।

আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিক অব সায়েন্সেস-এর পক্ষ থেকে ১১ জন বিজ্ঞানী ২০১৩ সালে জানিয়েছেন, করোনা জাতীয় ভাইরাসের উৎপত্তি বন্যপ্রাণি থেকে। যেমন, গভীর অরণ্যে গাছে বা গুহায় বসবাসকারী নানা ধরনের বাদুর বা অন্য কোনও প্রাণি থেকে ভাইরাস নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শুয়োর, প্যাঙ্গোলিন, হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য কিছু পালিত পশুকে সংক্রামিত করছে, তারপর সেই পশু থেকে ভাইরাস মানবদেহে ছড়াচ্ছে। (সূত্র ৫) তারা এবং আরও অনেকে বলেছেন, প্রাচীনকালে জঙ্গলে শিকারী মানুষ তো বটেই, এমনকি যখন থেকে মানুষ কৃষিকার্যে লিপ্ত হয়েছে, জঙ্গল কেটে বসত গড়েছে ও কৃষিকাজে জমি ব্যবহার করা শুরু করেছে, তখন থেকে তারা বন্যপ্রাণির সংস্পর্শে এসেছে। সেই বন্যপ্রাণি থেকে সরাসরি অথবা দ্বিতীয় কোনও প্রাণি-মাধ্যমের সাহায্যে মানুষ নানা ভাইরাস বা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এর ফলে পুরাকালে মানুষ রোগে ভুগে উজার হয়ে গেছে, কিংবা ক্রমে তাদের অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি গড়ে উঠেছে। এক অঞ্চল থেকে (খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে) ভিন্ন অঞ্চলে গমন, যুদ্ধবিগ্রহ (অর্থাৎ সৈন্যসামন্তের চলন), বাণিজ্য বিস্তার, এবং ঔপনিবেশিক

অভিযানের মাধ্যমে সেই জীবাণু স্থানান্তরিত হয়েছে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়ার বিস্তার ঘটেছে। (সূত্র ৬)

২০০৮ সালে একদল বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা গেছে, ১৯৬০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে মানুষ যে ৩৩৫টি নব-উদ্ভূত রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার ৬০ শতাংশ এসেছে বন্যপ্রাণি থেকে। মার্কিন সংস্থা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের (সিডিসি) মতে তা প্রকৃতপক্ষে ৭৫ শতাংশ! (সূত্র ৭) 'বিগ ফার্মস মেক বিগ ফ্লু' নামক গ্রন্থের রচয়িতা রব ওয়ালেস দেখিয়েছেন, বর্তমান শতকে, মাত্র ২০ বছরের মধ্যে মানুষ ২৭ ধরনের সংক্রামক রোগ, যেমন নানা ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা (যার মধ্যে করোনাও আছে), আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার, ইবোলা, ফুট-অ্যান্ড-মাউথ ডিজিজ, নিপা, জিকা, ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়েছে যেগুলির উৎপত্তি বন্যপ্রাণি থেকে। (সূত্র ৮)

প্রশ্ন হল, এই 'অত্যাধুনিক' যুগে 'সুসভ্য' মানুষ বন্যপ্রাণি-বাহিত ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে কেন? আসলে এই প্রশ্নের উত্তর জটিল কিছু নয়, যদিও ট্রাম্প-জনসনের ধামাধরা সংবাদমাধ্যম ও ভাড়া করা বিশেষজ্ঞরা তা চেপে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। চীনের শিল্পোন্নত শহর উহানের কথাই ধরা যাক। প্রচারিত হচ্ছে যে, উহানে যে বিশাল মাছ-মাংসের বাজার আছে – সেখানে নানা জাতীয় বন্য জীবন্ত পশু কেনাবেচা হয় – ঐ বাজারগুলি থেকেই কোভিড-১৯ ভাইরাস এসে মানবদেহে সংক্রামিত হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, বাদুর থেকে শুয়োর কিংবা প্যাঙ্গোলিন সংক্রামিত হয়েছে, তাদের থেকে তা মানবদেহে ছড়িয়েছে। উহানের সেই মাছ-মাংসের বাজার এবং চীনের মানুষদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় যথেচ্ছ ব্যঙ্গবিদ্রূপ চলছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস লিখেছে, ঐ বাজারগুলিতে ''সর্বভূক'' চীনাদের জন্য আস্ত মুরগি – মাথা ও ঠোঁট সহ – ঝুলিয়ে রাখা হয়। এছাড়া সাজিয়ে রাখা হয়, ''জীবন্ত সাপ, কচ্ছপ ও ভাম, গিনিপিগ, বাঁশগাছের ইঁদুর, পতঙ্গ, শজারু জাতীয় প্রাণি, গন্ধগোকুল, এমনকি বন্য কাঁকড়া''। (সূত্র ৯) এই বর্ণনা শুনে 'সুসভ্য' পশ্চিমিরা শিউরে উঠেছে। 'অখাদ্য-কুখাদ্যভোজী' চীনাদের সম্পর্কে সযত্নে লালিত-পালিত পাশ্চাত্য উচ্চমন্যতা তাদের মধ্যে আরও পোক্ত হয়েছে। সম্ভবত, অনেক 'সংস্কৃতিবান' ভদ্রলোক ভারতীয়ও চীনা মানুষদের খাদ্যাভ্যাসের সংস্কৃতি নিয়ে টীকাটিপ্পনি করে থাকেন। অবশ্য, যারা 'অসভ্য-জংলি' দলিত-আদিবাসীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশে অভ্যস্ত, তাদের কাছ থেকে ভিন্ন ব্যবহার আশা করা ন্যায্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে, নয়া-উদারনৈতিক পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলির অনুসরণে ও অনুকরণে যে চীনা ধাঁচের পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে তার অনিবার্য পরিণাম হল গভীর অরণ্যের বন্যপ্রাণির সঙ্গে মানুষের আরও বেশি পরিমাণে সংযোগ ঘটা। শিল্পোন্নত হুবেই প্রদেশের উহান শহরে দু'টি প্রক্রিয়া দেখা যায়। প্রথমত, 'উন্নয়ন' তথা 'বিকাশের' নাম করে পুঁজিবাদী 'সভ্যতা' গভীর বনজঙ্গল দ্রুত সাফ করে দিয়ে কৃষিভিত্তিক খামার, শিল্প, খনি, নগরায়ণ, রাস্তাঘাট, ইত্যাদির প্রসার ঘটিয়ে চলেছে দ্রুত হারে। ফলে গভীর জঙ্গলের প্রাণি (ধরা যাক, বাদুর) খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসছে, মানুষের পালিত পশু, যেমন শুয়োর, গরু, মোষ, মুরগি, হাঁস, ইত্যাদির সংস্পর্শে আসছে এবং বাদুর থেকে ভাইরাস ঐ প্রাণিগুলোর মাধ্যমে মানবদেহে সংক্রামিত হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বাদুর প্রায় ৬৫টি জীবাণুর বাহক যা মানুষের মধ্যে রোগের সংক্রমণ ঘটাতে পারে। (সূত্র ১০) দ্বিতীয়ত, চীনা কৃষকরা যে প্রাণিগুলির চাষ করত, যেমন শুয়োর, ভেড়া, মুরগি, ইত্যাদি – সেই ব্যবসা এখন বৃহদাকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলির দখলে। এই কোম্পানিগুলো গত চল্লিশ বছর ধরে চীনা রাষ্ট্রের সহায়তায় কৃষকদের থেকে পশুচারণের জমি কেড়ে নিয়েছে, ছোট ব্যবসাগুলিকে গিলে খেয়েছে, বিশাল পশুখামারের পত্তন ঘটিয়েছে। ফলে, জমিচ্যুত চাষিরা কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তিপ্রথায় আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছে এবং গভীরতর অরণ্য থেকে বন্যপ্রাণি সংগ্রহ করে তা বহুজাতিক বা তাদের এজেন্টের হাতে তুলে দিয়েছে। বেশ কিছু চাষি জীবিকাচ্যুত হয়ে মজুরিদাস শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। কিছু চাষি অবশ্য 'স্বাধীনভাবে' ব্যবসা করার অভ্যাস ত্যাগ না করতে পেরে আরও গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছে বন্যপ্রাণির সন্ধানে। ফলে বন্যপ্রাণির সঙ্গে মানুষের 'মেলামেশা' অব্যাহত থেকেছে। বাস্তুতন্ত্রে প্রতিটি প্রাণির একটা নিজস্ব জগত বা গণ্ডি থাকে। সেই গণ্ডি নয়া-উদারনৈতিক পুঁজিবাদ চরমভাবে ধ্বংস করে চলেছে। ফলে, চীনা মাছ-মাংসের বাজার

থেকেই হোক, বা বহুজাতিক কোম্পানির মাংস ব্যবসার সূত্রেই হোক, বাদুর থেকে শুয়োর এবং শুয়োর থেকে মানবদেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়।

মাংস ব্যবসাকারী বহুজাতিক কোম্পানিগুলির পশুখামার পরিচালন পদ্ধতির বিশ্লেষণ দেখাবে কীভাবে তারা অতি মুনাফার তাড়নায় ভাইরাস সংক্রমণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে শুয়োরের মাংস বিক্রি হয় সর্বাধিক – ৩৫-৪০ শতাংশ, মুরগির মাংস ৩৫ শতাংশ এবং গরু-মোষের মাংস ২২ শতাংশ। (সূত্র ১১) মার্কিন বহুজাতিক স্মিথফিল্ড ফুডস হল শুয়োরের মাংস ব্যবসায় বিশ্বের এক নম্বর কোম্পানি। চীন, পোল্যান্ড, ব্রিটেন, রুমানিয়া, মেক্সিকো, ইত্যাদি দেশে তাদের ব্যবসা বিস্তৃত। আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনায় অবস্থিত তাদের দানবাকৃতি কারখানা থেকে ২০০০ সালেই প্রতি দিনে ৩২ হাজার শুয়োর প্রক্রিয়াকরণ হত। (সূত্র ১২) স্বাভাবিকভাবে, সুবৃহৎ খামারে যতটা সম্ভব গাদাগাদি করে হাজার হাজার শুয়োর ঠাসা হয়। বিষ্ঠা-খাবার-সার-ওষুধ-শিল্পজাত বর্জ্য দ্রব্যে মাখামাখি অবস্থায় চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকা শুয়োরগুলির একটা থেকে আর একটায় ভাইরাসের চলন ঘটে অনায়াসে। বস্তুত, খোলা প্রান্তরে বিভিন্ন পশুর চাষ – যেমন শুয়োর, গরু, মোষ, মুরগি, হাঁস, ইত্যাদির চাষের ফলে যে-ভাইরাস শুধু শুয়োরকেই আক্রমণ করে, তারা সহজ শিকার পায় না। কিন্তু একফসলী চাষে (এখানে যা শুয়োর) ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে অতি সহজেই। (সূত্র ১৩) ঐ ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে সব শ্রমিকদের কাজ করতে হয়, শুয়োর জবাই করতে হয়, তাদের অবস্থা শোচনীয়। এরা মূলত অ-রেজিস্ট্রিকৃত অনুপ্রবেশকারী শ্রমিক, যারা যে কোনও অবস্থায় যে কোনও কাজ করতে বাধ্য। ফলে শুয়োর থেকে মানবদেহে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটার অতি-অনুকূল অবস্থা পশুখামারগুলিতে বিরাজমান। (সূত্র ১৪) 'বার্ড ফ্লু: এ ভাইরাস অব আওয়ার ওন হ্যাচিং' গ্রন্থের লেখক মাইকেল গ্রেগরের মতে ''যদি আপনি প্রকৃতই বিশ্বব্যাপী অতিমারি ঘটাতে চান, তাহলে পশুখামার নির্মাণ করুন''। (সূত্র ১৫)

যে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিশ্ব জুড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলে দিয়েছে তাতে মৃত্যুহার কিন্তু অত্যধিক নয় – উহানে ছিল মাত্র ২-৪ শতাংশ। অর্থাৎ, ১০০ জন আক্রান্ত হলে মারা যায় ২-৪ জন। তবে ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনের মতো দেশে এই হার তুলনায় বেশি। অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি, যেমন, সার্স-এর ক্ষেত্রে মৃত্যুহার ১০ শতাংশ, ১৯১৮ সালে যে স্প্যানিশ ফ্লু দেখা দিয়েছিল এবং বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল তাতে মৃত্যুহার ছিল ৫-২০ শতাংশ, এভিয়ান ফ্লুর ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ এবং ইবোলার ক্ষেত্রে তা ৯০ শতাংশ! (সূত্র ১৬) তাই ইবোলার মতো সংক্রামক রোগ যদি বর্তমান করোনার মতো আগ্রাসন দেখাত, তবে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াত তা অনুমান করা বেশ কষ্টকর।

২০১৫ সালে ইবোলা সংক্রমণ শুরু হয় পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গিনি (Guinea) থেকে। তবে ২০১০ সালে সিয়েরা লিয়ন এবং আরও পাঁচ বছর আগে পঃ আফ্রিকার অন্যত্র ইবোলার অস্তিত্ব চোখে পড়েছিল। গিনিতে চাষ হয় পামগাছের, যা থেকে পাম তেল উৎপন্ন হয়। আগে ছোটখাটো চাষিরা এই চাষ করত। কিন্তু অচিরেই সেখানে বৃহৎ কোম্পানির আবির্ভাব ঘটল। জঙ্গল কেটে খনি, নিবিড় চাষাবাদের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বস্তুত, গত কয়েক দশকে প্রায় ৯০টি মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি দঃ পূঃ এশিয়া, আফ্রিকা, দঃ আমেরিকার বহু স্থানে বনভূমি কেটে সাফ করে হয় খনি, অথবা জৈব-ডিজেল, কিংবা নিবিড় খামার গড়ে চাষাবাদ শুরু করেছে। মার্কিন কোম্পানি ছাড়া ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, চীনা কোম্পানিরাও ভীড় করেছে। গিনির যেখানে ইবোলার সংক্রমণ শুরু হয়, সেখানকার লক্ষাধিক হেক্টর জমি ৯৯ বছরের জন্য বহুজাতিকদের লিজ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ইউরোপীয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের অর্থপুষ্ট একটি কোম্পানী আগেকার ব্যবসার চারগুণ বড় পামতেল কারখানা নির্মাণ করেছে। এরপরের ঘটনা অনেকটা চীনের মতোই। গভীর জঙ্গলে বহুজাতিকদের হাত পড়া, বন্য প্রাণি সংগ্রহের জন্য গিনির মানুষ গভীরতর জঙ্গলে প্রবেশ করলে বাদুরের স্বাভাবিক বাসস্থান বিঘ্নিত হওয়া। বাদুর পাম গাছের ফল ও আশ্রয়ের উপর নির্ভরশীল হল। বাদুরের লালারস অথবা মূত্র থেকে পামফল তথা পামতেল সংক্রামিত হল। দেখা দিল ইবোলা মহামারি। (সূত্র ১৭) ১৯৭৬ সালে সুদানেও ইবোলা সংক্রমণ দেখা গিয়েছিল। তখন তা ছড়িয়েছিল তুলো চাষ থেকে। (পূর্বোক্ত)

মোটামুটি একই কাহিনী অন্যান্য ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। দঃ পূঃ এশিয়ায় নিপা ভাইরাস, ব্রাজিলে জিকা ভাইরাস, ১৯৯৭ সালে হংকং-এর মুরগি খামার থেকে এভিয়ান ফ্লু (সেখানেও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হাজার হাজার মুরগি ঠাসাঠাসি করে চাষ হয়), ২০০৩ সালে চীনের গুয়াংডং প্রদেশ থেকে সার্স ভাইরাস, ২০১২ সালে সৌদি আরবে বাদুর থেকে উট এবং উট থেকে মানুষে মার্স ভাইরাস সংক্রমণ – কাহিনী সর্বত্র অনুরূপ। বস্তুত, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় বৃষ্টিস্নাত অরণ্য নির্মূল করে নয়া-উদারনৈতিক পুঁজিবাদী 'উন্নয়ন' ও 'বিকাশ'-এর ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০১০-২০২০ সালের মধ্যে আফ্রিকার ৩ কোটি ৯০ লক্ষ হেক্টর এবং দক্ষিণ আমেরিকার ২ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টর অরণ্য উজার হয়ে গেছে। (সূত্র ১৮) ফলে জৈব-বৈচিত্র্য ক্রমশ ধ্বংস হয়ে চলেছে। গভীর অরণ্যে ভাইরাসের আধার বন্যপ্রাণিদের স্বাভাবিক জীবনচক্র বিশাল পরিমাণে বিঘ্নিত হচ্ছে। ভাইরাস সংক্রমণের হার ত্বরান্বিত হচ্ছে। এছাড়া, বহুজাতিকরা যেভাবে বৃহদাকার পশুখামারগুলি পরিচালনা বা চাষ করছে তারও ফলে ভাইরাস সমপ্রজাতির বা সমজিনসম্পন্ন এক প্রাণির সংলগ্ন অন্য প্রাণিতে দ্রুত সংক্রামিত হচ্ছে। পশুদের থেকে খামারে কর্মরত শ্রমিকরাও সংক্রামিত হচ্ছে। চীন, থাইল্যান্ড, গায়না, মেক্সিকো, আমেরিকা, সর্বত্র বৃহদাকার পশুখামারগুলি ভাইরাস সংক্রমণের অন্যতম মাধ্যম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, গত ৫ মে-র মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৯টি প্রদেশে ১৭০টি মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় দশ হাজার শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ন্যূনতম পক্ষে ৪০ জন শ্রমিক মারা গেছে। অথচ কারখানাগুলো চালু রাখা হয়েছিল কেননা স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প দেশে মাংসের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য মাংসের কারখানাগুলিকে ১৯৫০ সালের ডিফেন্স প্রোডাকশন অ্যাক্টের আওতার বাইরে রেখে দিয়েছিলেন! (সূত্র ১৯) পুঁজিপতিদের মুনাফার কাছে শ্রমিকদের জীবনের দাম তো কিছুই নয়!

কিন্তু, এত মাংস উৎপাদন হচ্ছে, তা খাচ্ছে কারা? বিশ্বে মুরগির মাংসের ব্যবহার ১৯৬১-২০১৪ সালের মধ্যে ১২ গুণ বেড়ে গিয়েছে। শুয়োরের মাংসের ব্যবহার বেড়েছে ৪-৫ গুণ। তাৎপর্যপূর্ণ হল, যারা যত বেশি ধনী তারা তত বেশি মাংস খায়। ২০১৪ সালে বিশ্বে প্রতিটি মানুষ বছরে গড়পরতা ৪৩ কেজি মাংস খেত। ভারতীয়রা বছরে মাংস খায় মাথাপিছু মাত্র ৪ কেজি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ানরা বছরে মাথাপিছু ১১৬ কেজি, উত্তর আমেরিকানরা ১১০ কেজি এবং ইউরোপীয়ানরা ৮০ কেজি মাংস খায়। (সূত্র ২০) তারা এতটাই মাংস খাচ্ছে যে, বিজ্ঞানীরা 'স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য' উত্তর আমেরিকানদের ৮৪ শতাংশ এবং ইউরোপীয়দের ৭৭ শতাংশ কম মাংস খেতে বলছেন! (সূত্র ২১) অন্যদিকে দরিদ্র বিশ্বের অসংখ্য মানুষ প্রোটিনের অভাবে অপুষ্টিতে ভোগে, অপুষ্টিজনিত রোগে মারা যায়। বরং, মাংসের ভোগবিলাস এবং মাংস উৎপাদনকারী বহুজাতিকদের লালসার দাম দিতে হয় গরিব দুনিয়ার অসংখ্য মানুষকে। যত বেশি পশুখামার ততই ভাইরাসের সংক্রমণ! এই পশুখামারগুলিতে সবচেয়ে বেশি পুঁজি ঢালছে যে পুঁজিবাদ তারা এখন প্রাচ্যদেশীয় বা গরিব দেশগুলির মানুষের খাদ্যাভ্যাস-রুচি-সংস্কৃতির দিকে আঙুল তুলছে নিজেদের আড়াল করার জন্য। চীন মুরগির মাংস রপ্তানিতে বিশ্বে প্রথম-স্থানীয়। কিন্তু চীনের সেই ব্যবসায় মার্কিন বহুজাতিক ব্যাঙ্ক গোল্ডম্যান স্যাক্সের পুঁজি খাটছে। (সূত্র ২২) সবচেয়ে বড় পোলট্রি ব্যবসার মালিক হল মার্কিন বহুজাতিক টাইসন কোম্পানি। মেক্সিকোর শুয়োর খামারে পুঁজি ঢালছে বৃহৎ পুঁজিবাদী কোম্পানি স্মিথফিল্ড ফুডস। সিংহভাগ মাংস খাচ্ছে ধনী ব্যক্তিরা, মাংস ব্যবসায়ে পুঁজি দিচ্ছে সেই ধনী দেশগুলির বহুজাতিক কোম্পানি। তার উপর, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিত্তবানদের ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় শোভা পাচ্ছে বন্য প্রাণি – বাঘ, কুমির, ভালুক, বাঁদর, সাপ থেকে অক্টোপাস! তবু পুঁজিবাদী দেশের নেতারা বলে চলেছেন, ভাইরাস ছড়াচ্ছে নাকি গরিব 'পীত', 'কৃষ্ণকায়', মুসলমান কিংবা অনুপ্রবেশকারী ও উদ্বাস্তু মানুষ!

আসলে পুঁজিবাদ বা 'আধুনিক সভ্যতা' যেখানেই অত্যধিক বিকশিত হয়েছে তা ভাইরাস বা জীবাণুর সংক্রমণকে ত্বরান্বিত করেছে। ১৯৯০-এর দশকের শেষদিকে মেক্সিকো থেকে যে সোয়াইন ফ্লু ছড়িয়ে পড়েছে বলে কথিত, তা প্রকৃতপক্ষে প্রথম দেখা দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার পশুখামারে – মার্কিন সরকারের সিডিসি-র প্রধান নিজেই তা

স্বীকার করেছেন। (সূত্র ২৩) এ ধরনের দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন, ১৯১৮-১৯ সালে যে স্প্যানিশ ফ্লু অতিমারি হয়েছিল তার উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসে। (সূত্র ২৪) আমেরিকা, পঃ ইউরোপ তো বটেই, চীন, হংকং, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ইত্যাদি দেশ হয়ে উঠেছে ভাইরাস সংক্রমণের এক-একটি হটস্পট।

কিন্তু কোনও একটি দেশে উৎপত্তি ঘটার পর ভাইরাস অতি দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে কীভাবে? এর উত্তরও নিহিত আছে পুঁজিবাদী ভুবনীকরণে। চীনের শিল্পোন্নত উহান শহরে যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে তা পৃথিবীর ৬০টি গন্তব্যস্থলের সঙ্গে যুক্ত। ২০১৯ সালে উহান থেকে ৫১ কোটি ৫০ লক্ষ অন্তর্দেশীয় বিমান এবং ২০১৬ সালে ৫ কোটি ১৬ লক্ষ আন্তর্দেশীয় বিমান ওঠানামা করেছে। ফলে, উহান থেকে রোম কিংবা প্যারিস, অথবা লন্ডন বা নিউ ইয়র্ক এখন কয়েক ঘণ্টার দূরত্ব। (সূত্র ২৫) ব্যবসা ও কর্ম সূত্রে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের আনাগোনা। আরও লক্ষ্য করা যাবে – করোনা ভাইরাস সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে প্রধানত তিনটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত দেশগুলিতে – এই কেন্দ্রগুলি হল পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা – যারা সবচেয়ে বেশি পুঁজিবাদী, সবচেয়ে ভুবনীকৃত, পুঁজির সঞ্চলনের সূত্রে সবচেয়ে বেশি পরস্পর সংযুক্ত। (সূত্র ২৬) ভারতে করোনা এসেছে পুঁজির গতিপথ ধরেই। অর্থাৎ, মধ্য আফ্রিকার এইচআইভি ভাইরাস, দঃ পূঃ এশিয়ার নিপা ভাইরাস অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জার বহু ধরনের ভাইরাসের হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেওয়া ভুবনীকৃত বিশ্বে কোনও ব্যাপারই নয়। প্রকৃতপক্ষে অতীতে, যেমন স্প্যানিশ ফ্লু ভাইরাস (কোনও দেশের নামে ভাইরাস চিহ্নিত হওয়া উচিত কি না সে প্রশ্ন জোরালোভাবে তোলা উচিত) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনী যে যে পথে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চালান হয়েছে, মোটামুটি সেই পথ ধরেই তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ৫৪১ সালে বুবোনিক প্লেগ জাহাজপথে যাত্রা করেছিল; ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরেশিয়াতে মোগল অভিযানের পথ ধরে বিস্তৃত হয়েছিল প্লেগ। এমনকি কলেরা, টিবি, স্মল পক্সের মতো ব্যাধিও ছড়িয়ে পড়েছে বাণিজ্যপথে – জাহাজে বা স্থলপথে। এই ধরনের উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। (সূত্র ২৭) অর্থাৎ, অতিমারি থেকে এই পুঁজিবাদী ভুবনীকৃত বিশ্বে বাঁচার কোনও রাস্তা খোলা নেই। তাই কিছু মার্কসবাদী আওয়াজ তুলেছেন: হয় ধ্বংস কিংবা বিপ্লব – যে কোনও একটি বেছে নিন। (সূত্র ২৮)

অসংখ্য ভাইরাস এই বিশ্বে চিরকাল ছিল, এখনও আছে, যতদিন বিশ্ব টিকবে, ততদিন থাকবে। থাকবে ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া, ইত্যাদি জীবাণু। বস্তুত, জীবাণুগুলি আমাদের বাস্তুতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষ যতদিন রোগ প্রতিকারের ওষুধ জানত না, ততদিন সে লাখে লাখে মারা গেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিভাইরাল ও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে, অথবা নিজেদের ইমিউনিটির জোরে মানুষ রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে। আসলে ভাইরাস আমাদের বাস্তুতন্ত্রে কোনও 'বহিরাগত' নয়, 'অনুপ্রবেশকারী' নয়, কিংবা 'অভিযানকারী' নয়। বাস্তুতন্ত্রে বর্তমান যত ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়ার কথা মানুষ জানে, তার থেকে অজানা জীবাণুর সংখ্যা বহু গুণ বেশি। তারা ছিল, আছে, এবং থাকবে বন্যপ্রাণিতে, অনাঘ্রাত অরণ্যে কিংবা সমুদ্রের অতল গহ্বরে। তারা আছে তাদের মতো। মানুষ ও অন্যান্য পালিত পশুরও থাকার কথা নিজের মতো – পরস্পর পৃথক, কিন্তু আন্তঃনির্ভরশীল জগতে। বাস্তুতন্ত্রের এই ভারসাম্য বিঘ্নিত করলে মানুষ নিজের কবর নিজেই খুঁড়বে। বস্তুত, আধুনিক পুঁজিবাদ তাই করছে – তা সে চীনা ধাঁচের পুঁজিবাদ হোক, বা হোক না সে মার্কিন ধাঁচের। পুঁজিবাদ সামগ্রিকভাবে পরিবেশ দূষিত করছে, ধ্বংস করছে, জলবায়ু পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। খরা-বন্যা-ঘূর্ণিঝড়-দাবানল জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমশ হয়ে উঠেছে পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য।

পুঁজিবাদ বাস্তুতন্ত্রের কী ক্ষতি করে চলেছে তা পুঁজিপতিরা অল্পবিস্তর বুঝলেও তাদের মুনাফার লালসা এতটাই সর্বগ্রাসী যে এই আশু সর্বনাশা ভবিষ্যৎকে তারা স্বীকারই করে না। কিন্তু বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে মানবসমাজের সম্পর্ক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা সর্বহারা সহ সচেতন মানুষের কাছে খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে। বাস্তুতন্ত্র মানুষের কাছে কোনও বহির্জগত নয়। তা মানবসমাজের বিরুদ্ধ কোনও জগতও নয়। মানবসমাজ বাস্তুতন্ত্রেরই এক অংশ। বাস্তুতন্ত্র এমন কোনও ভোগের বস্তু

নয় যে মানুষ তাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করবে, তাকে নিঃস্ব করবে, কিংবা তাকে শেষ করে দেবে। অথচ বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ সেই কাজটাই করে চলেছে! প্রায় পৌনে দুশো বছর আগে কার্ল মার্কস বলেছিলেন, "উৎপাদিকা শক্তির বিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়ে আমরা দেখব উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও ব্যবসার উপায়সমূহ তখনকার বিদ্যমান পর্যায়ে শুধুমাত্র ধ্বংস করছে। তারা আর উৎপাদিকা শক্তি নয়, বরং ধ্বংসের শক্তি।" (সূত্র ২৯)

করোনা অতিমারি মানুষের জীবন-জীবিকার কতখানি ক্ষতি করবে জানি না। আসলে শেষ পর্যন্ত মানুষ বাঁচবে, নাকি পুঁজিবাদী সমাজ তাদের কুকীর্তি চালিয়ে গ্রহটাকে ধ্বংসের দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যাবে – প্রশ্ন এখন তাই নিয়ে।

সূত্র:

১) ০১.০৫.২০, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52496098; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

২) ১৩.০৩.২০, https://www.opendemocracy.net/en/countering-radical-right/coronavirus-and-radical-right-conspiracy-disinformation-and-xenophobia/; ২৪.০৪.২০-এ সংগৃহীত।

৩) ২৬.০৪.২০, https://www.bbc.com/news/world-52224331; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৪) ০৯.০৩.২০, https://www.nbcnews.com/think/opinion/coronavirus-fears-show-how-model-minority-asian-americans-become-yellow-ncna1151671; ১৯.০৩.২০, https://www.vice.com/en_us/article/884bvv/coronavirus-is-giving-europes-far-right-the-perfect-excuse-to-scapegoat-refugees; ২৪.০৪.২০-এ সংগৃহীত।

৫) ১৩.০৫.১৩, https://www.nap.edu/read/18975/chapter/13; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৬) সূত্র ৫ দ্রষ্টব্য এবং ২২.০৩.২০, http://isj.org.uk/socialism-in-a-time-of-pandemics/; ১২.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৭) ১৩.০৪.২০, https://seniorstoday.in/trending/the-arrogance-of-mankind/; ০৩.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৮) ২৯.০১.২০, https://climateandcapitalism.com/2020/01/29/coronavirus-a-deadly-result/; ১২.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৯) ৩১.০১.২০, https://theconversation.com/why-shutting-down-chinese-wet-markets-could-be-a-terrible-mistake-130625; ১৯.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১০) ১৬.১০.১৪, https://theconversation.com/ebola-bats-get-a-bad-rap-when-it-comes-to-spreading-diseases-32785; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১১) https://ourworldindata.org/meat-production; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১২) ১০.১২.১৮, https://www.foodprocessing.com/articles/2018/poty-smithfield-foods/; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১৩) ০২.০৫.২০, https://www.theguardian.com/world/2009/may/02/swine-flu-pandemic-mexico-pig-farming; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত। এছাড়া, ২৭.০৪.০৯, https://socialistworker.org/2009/04/27/capitalism-and-the-flu; ১৪.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১৪) ২৮.০৪.২০, http://isj.org.uk/socialism-in-a-time-of-pandemics/; ১২.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১৫) ২৪.০৩.২০, https://blogs.scientificamerican.com/observations/one-root-cause-of-pandemics-few-people-think-about/; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১৬) সূত্র ৮ দ্রষ্টব্য।

১৭) ২৯.০৭.১৫, https://www.counterpunch.org/2015/07/29/neoliberal-ebola-the-agroeconomic-origins-of-the-ebola-outbreak/; ১২.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১৮) গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০২০, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অ্যাসোসিয়েশন অব দ্য ইউনাইটেড নেশনস, https://doi.org/10.4060/ca8753en; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১৯) ১৪.০৫.২০, https://mronline.org/2020/05/14/the-jungle-pandemic-edition/; ১৬.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

২০) সূত্র ১১ দ্রষ্টব্য।

২১) ১৬.০১.১৯, https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/16/new-plant-focused-diet-would-transform-planets-future-say-scientists; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

২২) ২৮.০৩.২০, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/is-factory-farming-to-blame-for-coronavirus; ১৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

২৩) সূত্র ২১ দ্রষ্টব্য।

২৪) সূত্র ১৫ দ্রষ্টব্য।

২৫) সূত্র ১৪ দ্রষ্টব্য।

২৬) ১৭.০৪.২০, https://mronline.org/2020/04/17/marx-in-the-era-of-pandemic-capitalism/; ১৮.০৪.২০-এ সংগৃহীত।

২৭) সূত্র ১৪ দ্রষ্টব্য।

২৮) ০১.০৪.২০, https://mronline.org/2020/04/01/catastrophe-capitalism-climate-change-covid-19-and-economic-crisis/; ০২.০৪.২০-এ সংগৃহীত।

২৯) কার্ল মার্কস, জার্মান আইডিওলজি, সূত্র ২৫-এ উদ্ধৃত।